দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে’

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এমন একজন কবি, যিনি দেশপ্রেম, মানবতাবাদ, আধ্যাত্মিকতা এবং জীবনদর্শনের এক অনন্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাঁর কাব্যে যেমন স্বদেশপ্রেমের দীপ্ত আহ্বান শোনা যায়, তেমনি মানুষের অন্তর্জীবনের গভীর অনুসন্ধানও লক্ষ্য করা যায়। তিনি কেবল একজন কবি নন, একজন নাট্যকার, গীতিকার ও চিন্তাবিদ হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। তাঁর রচিত বহু গান আজও বাঙালির হৃদয়ে সমানভাবে অনুরণিত হয়।

‘**মহাসিন্ধুর ওপার থেকে**’ কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ভাবধারার কবিতা। এই কবিতায় কবি মানুষের পার্থিব জীবন, সংসারের মোহ, মৃত্যু-ভয়, দুঃখ-কষ্ট এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে গভীর প্রতীকী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এখানে ‘মহাসিন্ধু’ কেবল একটি সমুদ্র নয়; এটি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সীমারেখা, আর ‘ওপার’ হলো চিরশান্তি, মুক্তি ও পরম সত্যের প্রতীক। সেই ওপার থেকে ভেসে আসা সঙ্গীত আসলে মানুষের আত্মার প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান।যার দ্বারা মানুষ যেন সংসারের মায়া, অহংকার, ভয় ও দুঃখের বন্ধন ছিন্ন করে চিরসত্য ও পরম আনন্দের পথে অগ্রসর হয়। কবির ভাষায় এটি এক অনন্ত আহ্বান, যা মানুষের আত্মাকে জাগ্রত করে এবং তাকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের দিকে ডেকে নিয়ে যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আলোচ্য কবিতাটি রচিত হয়েছে মানুষের আত্মিক মুক্তির ভাবনা থেকে। পৃথিবীতে মানুষ নানা দুঃখ, কষ্ট, লোভ, মোহ, হিংসা, অহংকার ও ভয়ের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। সে সংসারের নানা বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে নিজের প্রকৃত পরিচয় ভুলে যায়। অথচ মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য কেবল ভোগবিলাস নয়; তার চূড়ান্ত গন্তব্য হলো পরম সত্যের সন্ধান। ভারতীয় দর্শন, বিশেষত উপনিষদ ও বৈষ্ণব ভাবধারায় পৃথিবীকে ক্ষণস্থায়ী এবং ঈশ্বরকে চিরন্তন বলে মনে করা হয়েছে। এই কবিতায় সেই দর্শনেরই প্রতিফলন ঘটেছে। কবি দেখিয়েছেন, সংসারের সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জন্ম-মৃত্যু—সবই সাময়িক। এর ঊর্ধ্বে রয়েছে এমন এক জগৎ, যেখানে নেই মৃত্যু, নেই বার্ধক্য, নেই কোনো দুঃখ বা বিচ্ছেদ। কবিতার আহ্বান তাই কেবল মৃত্যুর আহ্বান নয়; এটি আত্মার জাগরণ এবং পরম সত্যের পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান।

কবিতার শুরুতেই কবি এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি অনুভব করেন, মহাসিন্ধুর ওপার থেকে এক অপূর্ব সঙ্গীত ভেসে আসছে। সেই সঙ্গীত যেন মানুষের হৃদয়কে আলোড়িত করে। কেউ একজন মধুর কণ্ঠে ডাকছে—“আয় চলে আয়।”এই ডাক কোনো সাধারণ মানুষের নয়; এটি পরম সত্তার ডাক। তিনি মানুষকে নিজের কাছে আহ্বান করছেন। তিনি বলছেন, এই পৃথিবীতে দুঃখ, মৃত্যু ও জরা রয়েছে, কিন্তু তাঁর রাজ্যে এসবের কোনো অস্তিত্ব নেই।তিনি আরও বলেন, সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান। বাতাসে সুগন্ধ, চারদিকে সঙ্গীতের ধারা, প্রকৃতি চিরসবুজ, আকাশ চিরজ্যোৎস্নাময়। সেখানে কোনো অন্ধকার নেই, নেই কোনো ভয় কিংবা হতাশা।

কবি মানুষের সংসারজীবনের অসারতা তুলে ধরেছেন। মানুষ অতীতের স্মৃতি, অহংকার, লোভ, দুঃখ ও মায়ার বোঝা বহন করে চলেছে। সেই বোঝাকে কবি ‘ভূতের বোঝা’ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ অতীত কখনও ফিরে আসে না, তবুও মানুষ সেই অতীতের ভার বয়ে বেড়ায়। কবি মানুষকে

সতর্ক করে বলেন—অকারণে এই বোঝা বহন করে লাভ নেই। জীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট না করে মানুষের উচিত পরম সত্যের পথে এগিয়ে যাওয়া। কবি এক অপূর্ব চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন যেখানে পূর্ণিমার আলোয় সুধাসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এই সুধাসিন্ধু অমৃতের প্রতীক। অর্থাৎ পরম আনন্দ ও মুক্তি মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে। কবি বলেন, সংসারের সমস্ত মায়া, অহংকার ও বন্ধন ত্যাগ করে মানুষের উচিত সেই পরম আনন্দের দিকে অগ্রসর হওয়া। কবি পৃথিবীকে এক কারাগারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মানুষ নিজেই নিজের অজ্ঞতা, লোভ ও অহংকারের কারণে এই কারাগারে বন্দি হয়ে আছে। অথচ সে বুঝতে পারে না যে মুক্তির পথ তার জন্য উন্মুক্ত।

কবি মানুষকে 'মূঢ়' ও 'অন্ধ' বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ মানুষ সত্যকে দেখতে পায় না। সে ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য চিরন্তন আনন্দকে ভুলে যায়। তাই কবি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলেন, পরম আনন্দময় সেই সত্তা মানুষকে সত্যিই ভালোবাসেন। তাই তিনি মানুষকে বারবার নিজের কাছে ডাকছেন। মানুষ আসলে ঈশ্বরের সন্তান; অথচ সে নিজের ঘর ছেড়ে পরের ঘরে অর্থাৎ সংসারের মোহে বন্দি হয়ে রয়েছে।

'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' কবিতার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মানুষের আত্মিক মুক্তির এক অনন্য কাব্যরূপ নির্মাণ করেছেন। 'মহাসিন্ধু', 'ওপার', 'সুধাসিন্ধু', 'ভূতের বোঝা', 'কারাগৃহ'—এই সব প্রতীক ব্যবহার করে তিনি বুঝিয়েছেন যে মানুষের প্রকৃত জীবন কেবল পার্থিব অস্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তার চূড়ান্ত গন্তব্য হলো পরম সত্য, শান্তি ও আনন্দের রাজ্য। কবিতায় রহস্যময় আহ্বান, প্রকৃতির অপূর্ব চিত্রকল্প এবং আধ্যাত্মিক আবেদন একত্রে মিলিত হয়ে পাঠকের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। এখানেই কবিতাটির বিশেষত্ব।